# যাকাত সম্পর্কিত মাসয়ালা মাসাইল

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

# যাকাত সম্পর্কিত মাসয়ালা মাসাইল

بسـم الله الـرحمن الـرحيم الحمـد لله والصـلاة والسـلام علـي رسـول الله أمـا بعـد

......................................................................

যাকাত প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ যার নিকট নিসাব পরিমান সম্পদ রয়েছে। সকল প্রকার সম্পদের উপর যাকাত ফরজ নয় যেমন, বাড়ি-গাড়ি, জমি-জমা ইত্যাদি সম্পদে যাকাত ফরজ নয়।

কেবল মাত্র চার প্রকার জিনিসের উপর যাকাত ফরজ,

(ক) সোনা-রুপা ও নগদ টাকা (الدرهم والدينار)

(খ) ব্যবসায়ী পণ্য (عروض التجارة)

(গ) ফল-মূল ও শস্যাদি (الحرث والثمار)

(ঘ) গৃহ পালিত চতুষ্পদ জন্তু (بهيمة الانعام)

উপরোক্ত প্রকার সমূহের মধ্যে চতুর্থ প্রকারটি সম্পর্কে আলোচনা করা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন যেহেতু গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কেবল উট, গরু-মহিষ এবং ছাগল-ভেড়ার উপর যাকাত ফরজ হয়। এ ক্ষেত্রে যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো এক জন ব্যক্তির মালিকানায় বছরের বেশিরভাগ সময় মাঠে চরে খাওয়া ৫ টি উট বা ৪০ টি ছাগল-ভেড়া বা ৩০ টি গরু-মহিষ থাকলে তবে তার উপর যাকাত ফরজ হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে মাঠে চড়ে খাওয়া এই সকল গৃহপালিত পশুর উপরোক্ত সংখ্যা এক জনের মালিকানায় থাকা প্রায় অসম্ব। অতএব এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ সংক্রান্ত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এসকল জন্তু যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের জন্য পালন করা হয় তখন এগুলোর মূল্যের উপর যকাত ফরজ হয় সেক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে নিসাব পূর্ণ হওয়া বা মাঠে চরে খাওয়া শর্ত নয় বরং অন্যান্য ব্যবসায়ীক পণ্যের মতো সোনা বা রুপার মূল্যের হিসাবে নিসাব পরিমানে পৌছালে তার উপর যাকাত ফরজ হবে এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আমরা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রথমে উল্লেখিত তিনটি প্রকার তথা সোনা-রুপা বা নগদ অর্থ, ব্যাবসায়ী পণ্য ও ফসলাদির উপর যাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করব ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ্।

# الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة

## সোনা-রুপা, নগদ টাকা ও ব্যবসায়ী পণ্য সংক্রন্ত মাসয়ালা সমূহ

**১-নং মাসয়ালাঃ** অলংকার হিসাবে ব্যবহার বা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে গচ্ছিত সোনা-রুপা নিসাব পরিমান হলে তাতে যাকাত ফরজ হবে। নিসাব পরিমান বলতে ২০০ দিরহাম রোপা বা ২০ দিনার সোনা বোঝায়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

দুই শত দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত (রুপাতে) কোনো যাকাত নেই যখন দুই শত দিরহাম হবে যখন তাতে পাঁচ দিরহাম আদায় করতে হবে।

[আবু দাউদ]

একইভাবে আবু দাউদ শরীফের অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে বিশ দিনার ( عشرون دينارا) না হওয়া পর্যন্ত সোনাতে কোনো যাকাত নেই যখন বিশ দিনার হবে তখন তাতে অর্ধ দিনার (نصف دينار) আদায় করতে হবে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ( فما زاد فبحساب ذالك) এর বেশি হলে এই হিসাবে আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সম্পদের পরিমান ২০০ দিরহাম রোপা বা ২০ দিনার সোনার চেয়ে বেশি হলে শতকরা ২.৫ হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

বর্তমান হিসাবে ২০০ দিরহাম রোপা বলতে সাড়ে বাহান্ন তোলা বা ভরি রোপা বোঝায় এবং ২০ দিনার সোনা বলতে সাড়ে সাত ভরি সোনা বোঝায়।

**২ নং মাসয়ালাঃ** সোনা বা রোপা ছাড়া অন্য যেসব মূল্যবান ধাতব পদার্থ মানুষ অলংকার হিসাবে বা সাজ সজ্জার উপরকরণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে তাতে যাকাত ফরজ হবে না। যেমন হীরা-জহরত, মাণি-মানিক্য ইত্যাদি। এই সব পদার্থ প্রচুর পরিমানে সংগ্রহ করে সঞ্চিত করে রাখলেও তাতে যাকাত ফরজ হবে না। তবে এগুলো বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখলে এগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ফরজ হবে। একইভাবে এই সকল ধাতু যখন মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন এগুলোর উপর যাকাত ফরজ হবে। বর্তমানে যেসব কাগজ বা ধাতব পদার্থের তৈরী মুদ্রা প্রচলিত আছে তার উপর যাকাত ফরজ হবে যদি তা সাড়ে বাহান্ন ভরি রুপা বা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের যে কোনো একটির মূল্যের সমান হয়।

**৩ নং মাসয়ালাঃ** ব্যবসায়ী পণ্যের উপরও যাকাত ফরজ হবে। এ ক্ষেত্রে যেসব পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয় সেগুলোর বর্তমান মূল্য হিসাব করে তা সোনা বা রুপার যে কোনো একটির নিসাবের সমান হলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেসব আসবাব পত্র বা সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য নয় বরং ব্যবহারের জন্য রাখা হয় যেমন আলমারি, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি সেগুলোর উপর যাকাত ফরজ হয় না। যে দোকানে কম্পিউটার, ফ্রিজ ইত্যাদি বিক্রয় করা হয় উক্ত দোকানের মালিক দোকানে বিক্রয়ের জন্য রাখা কম্পিউটার বা ফ্রিজের মূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করবেন কিন্তু যেখানে কম্পিউটার বা ফ্রিজ ব্যবহারের জন্য রাখা হয় সেখানে এগুলোর যাকাত দেওয়া লাগবে না।

***বিঃদ্রঃ*** [বর্তমান বাজার দরে [০৯-০৮-২০১২ ইং] রোপার মূল্য **১১০০** টাকা ভরি হিসাবে সাড়ে বাহান্ন ভরি রোপার মূল্য হয় [**১১০০×৫২.৫=৫৭৭৫০**] টাকা। সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের মূল্য এর চেয়ে অনেক বেশি সুতরাং বর্তমানে রুপার হিসাবে নগদ টাকা ও ব্যবসায়ী পণ্যের নিসাব হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ ৫৭৭৫০ টাকা বা তার সমমূল্যের ব্যবসায়ী পণ্যের উপর যাকাত ফরজ হবে। যেহেতু সোনা রুপার মূল্য সদা পরিবর্তনশীল তাই যিনি যাকাত প্রদান করতে চান তার জন্য উচিৎ হবে তখনকার মূল্য জেনে নিয়ে সে আলোকে নিসাবের হিসাব করা।]

**৪ নং মাসায়ালাঃ** যদি কারো নিকট ব্যবসায়ী পণ্য বা নগদ টাকা ও সোনা-রোপা থাকে তবে এগুলো একত্রে হিসাব করে নিসাব পরিমান হলে যাকাত ফরজ হবে। এ ক্ষেত্রে সোনা বা রুপার মূল্যের সাথে ব্যবসায়ী পণ্যের বর্তমান মূল্য ও নগদ টাকার পরিমান একত্রে হিসাব করে যদি তা রুপা বা সোনার যে কোনো একটির নিসাব পরিমানের সমান হয় তবে এগুলোর উপর একত্রে যাকাত ফরজ হবে যদিও পৃথক ভাবে এগুলো নিসাব পরিমান না হয়। যদি কারো নিকট ব্যবসায়ী পণ্য বা নগদ টাকা না থাকে শুধু মাত্র সোনা ও রুপা থাকে তবে সোনা ও রুপা একত্রে মিলিত করে তাদের উভয়ের মূল্যের পরিমান যদি সোনা বা রোপার যে কোনো একটির হিসাবে নিসাব পরিমাণ হয় তবে তাতে যাকাত ফরজ হবে।

وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الثَّمَنَيْنِ وَالذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ قِيمَةً

ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য সোনারুপার সাথে মিলিত করা হবে একইভাবে সোনার মূল্য হিসাব করে তা রুপার সাথে মিলিত করা হবে। [কানযুদ-দাকাইক্ব]

**৫ নং মাসয়ালাঃ** কেউ সোনা-রোপা, নগদ অর্থ বা ব্যবসায়ী পণ্যের নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হলেই তৎক্ষনাত তার উপর যাকাত ফরজ হয় না যতক্ষণ না এই সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

কোনো সম্পদে যাকাত নেই যতক্ষণ না তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়।

[আবু দাউদ]

এর অর্থ হলো যেদিন থেকে সম্পদ নিসাব পরিমান হয় তার পর হতে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত উক্ত সম্পদে যাকাত ফরজ হয় না। এ মাসয়ালাটির কয়েকটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

(ক) যদি কারো নিকট নিসাব পরিমান সম্পদ থাকে তবে ব্যবসার মাধ্যমে উক্ত সম্পদ হতে বের হওয়া লভ্যাংশে নতন করে বছর গণনা করতে হবে না বরং তার নিকট পূর্ব হতেই যে নিসাব পরিমান সম্পদ রয়েছে তার সাথে এই লভ্যাংশের যাকাত দিতে হবে। ইবনে কুদামা বলেন, (لا نعلم فيه خلافا) "এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই" [আল-মুগনী]।

(খ) যদি কারো নিকট নিসাব পরিমান সম্পদ থাকে এবং পরে উক্ত সম্পদের সাথে আরো কিছু সম্পদ যোগ হয় যা উক্ত সম্পদের লভ্যাংশ নয় তবে এই সম্পদকে মুস্তাফাদ (مستفاد) বলা হয়। মুস্তাফাদের বিধান সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের রায় হলো উপরে বর্ণিত লভ্যাংশের মতই মুস্তাফাদ সম্পদের উপরও নতুন করে বছর গণনা করা হবে না বরং পূর্বের মালের সাথেই এটার যাকাত আদায় করতে হবে। তবে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ সহ জমহুর (বেশিরভাগ) ওলামায়ে কিরামের মতে মুস্তাফাদ সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরজ হবে না। তাদের দলীল হলো রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী "কোনো সম্পদে যাকাত নেই যতক্ষণ না তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়" [আবু দাউদ]। অন্য একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে,

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

যে কেউ কোনো সম্পদ অর্জন করে তাতে যাকাত নেই যতক্ষণ না তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়। [তিরমিযী ও নাসায়ী]

এই হাদীসে সরাসরি ইস্তাফাদা (استفاد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেখান থেকে

মুস্তাফাদ (مستفاد) শব্দটি উদ্গত। ইমাম বাগাবী শারহে সুন্নাতে এবং হাফিজ ইবনে হাজার বুলুগুল মারামে বলেছেন এটি মারফু নয় বরং মাওকুফ হওয়াটাই বেশি সঠিক অর্থাৎ এটি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা নয় বরং ইবনে উমর (رضي الله عنه) এর কথা। জমহুর ওলামায়ে কিরাম এই হাদীসকেও দলীল হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

হানাফী মাযহাবের ওলমায়ে কিরাম (رحمه الله) নিজেদের মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন বছরের বিভিন্ন সময় যে সম্পদ অর্জিত হয় পৃথক পৃথকভাবে তার হিসাব রাখা ভীষণ কষ্টকর অতএব মূল সম্পদের সাথে একত্রে সেগুলোর যাকাত আদায় করে দেওয়া বেশি সহজ। অন্যান্য মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম এর জবাবে বলেন বরং উক্ত সম্পদে যাকাত ফরজ না হওয়ার বিধানটিই বেশি সহজ কেননা যাকাত ফরজ হলে সেটা আদায় করা বাধ্যতামূলক হচ্ছে আর যাকাত ফরজ না হলে সেটা আদায় করা বা না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকছে। [আল-মুগনী]

আমরা বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিষ্কার করতে চাই। ধরা যাক একজন ব্যক্তির নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা রয়েছে। তিনি প্রতি বছর রমজান মাসে যাকাত আদায় করে থাকেন। রমজানের ১ মা্স পূর্বে তথা শাবান মাসে জমি-জমা বিক্রয় করে আরো পাঁচ লক্ষ টাকা তার হস্তগত হলো। তিনি এই পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে শাওয়াল মাসে নিজের ব্যাবহারের জন্য একটি গাড়ি কিনতে চান। এখন হানাফী মাযহাব মতে রমজান মাসে যাকাত আদায়ের সময় তাকে এই পাঁচ লক্ষ টাকা সহ মোট দশ লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে তিনি ইচ্ছা করলে অন্যান্য সম্পদের সাথে এই সম্পদের যাকাত আদায় করতে পারেন ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারেন যেহেতু এই সম্পদের উপর এখনও এক বছর অতিবাহিত হয়নি। তিনি ইচ্ছা করলে এই সম্পদের উপর নতুন করে বছর অতিবাহিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শাওয়াল মাসে উক্ত সম্পদ ব্যায় হয়ে গেলে সেটার উপর আদৌ যাকাত ফরজ হবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার জন্য উক্ত সম্পদের হিসাব রোখে পৃথকভাবে যাকাত আদায় করা বেশি সুবিধা। অপরদিকে বছরের বিভিন্ন সময় ছোট অংকের যেসব সম্পদ হস্তগত হয় পৃথক ভাবে সেগুলোর হিসাব রাখা কষ্টকর মনে হলে মূল সম্পদের সাথে সেগুলোর যাকাত আদায় করা যাবে। যদি কেউ এ ক্ষেত্রে হিসাব-কিতাবের কষ্ট করতে চান তবে তিনি সেগুলোর পৃথক হিসাব রেখে সেগুলোর যাকাত পৃথকভাবে আদায় করার স্বাধীনতাও পাবেন। সুতরাং জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে মুস্তাফাদ সম্পদের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে সেটা ব্যক্তির অবস্থান ও পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে বেশি কল্যাণকর ও অধিক সহজ প্রমাণিত

হচ্ছে।

(গ) যদি কারো নিকট নিসাব পরিমাণ সোনা-রোপা বা নগদ অর্থ থাকে এবং সাত বা আট মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে বসবাসের জন্য একটি জমি বা ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি ক্রয় করে আর কিছু দিন পর উক্ত জমি বা গাড়ি পুনরায় বিক্রয় করে নগদ অর্থ অর্জন করে তবে এই নগদ অর্থের উপর নতুন করে বছর গণনা করতে হবে। কিন্তু যদি উক্ত সোনা-রোপা বা নগদ অর্থের বিনিময়ে কোনো ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে অথবা তার নিকট থাকা ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রয় করে সোনা রোপা বা নগদ অর্থ অর্জন করে তবে এ ক্ষেত্রে নতুন করে বছর গণনা করতে হবে না বরং পূর্বের সম্পদের উপর অতিবাহিত সময় হিসাব করে বছর গণনা করতে হবে। যেহেতু যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সোনা-রোপা, নগদ অর্থ ও ব্যাবসায়ী পণ্যকে একই প্রকার হিসাবে গণ্য করা হয় তাই একটার পরিবর্তে অন্যটি ক্রয়-বিক্রয় করলে নতুন করে বছর গণনার প্রয়োজন পড়ে না।

## الحرث والثمار

## ফল-মূল ও শস্যাদির উপর যাকাত

## [উশর]

উপরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, জমির উপর কোনো যাকাত নেই। কিন্তু জমিতে উৎপন্ন ফল-মূল ও শস্যাদির উপর যাকাত হবে। এই যাকাতকে উশর (العشر) বলা হয়। এ বিষয়টি পূর্বে উল্লেখিত বিষয়সমূহ হতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র একটি বিষয় একারণে আমরা এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসয়ালাসমূহের উপর পৃথকভাবে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

**১ নং মাসয়ালাঃ** ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমি দুই প্রকার। উশরী ভূমি (الارض العشرية) ও খারাজী ভূমি (الارض الخراجية)। খারাজ অর্থ ভূমি কর। আর উশর অর্থ ফসলের দশ ভাগের ১ ভাগ বা অবস্থা ভেদে বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা। ইমাম আবু হানীফা (رحمه الله) এর মতে যে জমির খারাজ আদায় করতে হয় তথা খারাজী জমিতে উশর ফরজ হয় না। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সহ জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে যদি কোনো খারাজী জমির মালিক মসলিম হয় তবে তার উপর একই সাথে খারাজ ও উশর উভয়ই ফরজ হবে। হানাফী মাযহাব মতে খারাজী জমিতে উশর ফরজ না হওয়ার বিষয়টিকে বর্তমানে কেউ কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। বর্তমানে সরকার যে ভূমি কর নেয় সেটাকে খারাজ হিসাবে কল্পণা করে অনেকে

ফসলের উশর আদায় করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতেও এটা সঠিক নয়। কেননা মুসলিমদের মালিকানায় যে ভূমি রয়েছে প্রথমত সেটাকে উশরী ভূমি হিসাবেই ধরা হবে যতক্ষণ না প্রমাণ পাওয়া যায় যে এটা খারাজী ভূমি। কোনো ভূমি খারাজী হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো এটা প্রমানিত হওয়া যে পূর্বে কোনো সময় মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের পরাজিত করে উক্ত ভূমি দখল করেছিল। এছাড়াও অন্যান্য শর্ত রয়েছে। যেমন দখল করার পর উক্ত জমি-জমা সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে থাকলে তা খারাজী জমি হবে না তবে দখলের পর উক্ত ভূমি উক্ত এলাকার কাফিরদের দিলে খারাজী জমি হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে কর দিয়ে বসবাস করে এমন জিম্মী (ذمي) কাফির যদি কোনো মুসলিমের জমি ক্রয় করে তবে হানাফী মাযহাব মতে উক্ত জমিও খারাজী জমি হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু বাংলাদেশের জমি-জমার ক্ষেত্রে এসকল শর্ত নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব। পূর্বের কোনো সময়ে এদেশের ভূখণ্ড মুসলিম সেনাবাহিনী কাফিরদের নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছিল কিনা বা ছিনিয়ে নিয়ে থাকলে সেটা মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা হয়েছিল নাকি কাফিরদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। জমি-জমার দলীল পত্রে যদি কোনো কাফিরের মালিকানা প্রমানিত হয়ও তবু সেটা হয়তো পাকিস্থান আমলে বা ইংরেজদের আমলে আর এটা নিশ্চিত যে ইংরেজ আমলে তো নয়ই এমনটি পাকিস্থান আমলেও জিজিয়া আদায় করে জিম্মী হিসাবে বসবাস করতো না বর্তমানেও জিজিয়া কর বা জিম্মী কাফিরের কোনো অস্তিত্ব নেই। আর এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, জিম্মী ছাড়া অন্যান্য কাফিরদের মালিকানার কারণে ভূমি খারাজী হয়ে যায় না। সুতরাং বাংলাদেশের জমি-জমা উশরী হিসাবেই গণ্য করতে হবে খারাজী হিসাবে নয়। যে জমি খারাজী নয় তাতে খারাজ আদায় করা যাবে না বরং উশর আদায় করতে হবে। তাছাড়া বর্তমানে সরকার ইসলামী নিয়ম-নীতিতে বৈধ সরকার নয় আর তারা যে ভূমি কর আদায় করে তা ইসলামী পদ্ধতিতে খারজ হিসাবে আদায় করা হয় না, খারাজের নিয়ম নীতিও অনুসরণ করা হয়না, খারাজ যে স্থানে ব্যয় করা উচিৎ সে স্থানে ব্যয় করাও হয়না। সুতরাং বর্তমানে সরকারের পক্ষ হতে যে ভূমিকর আদায় করা হয় তা মুসলিমদের উপর একটি অবিচার ছাড়া কিছু নয়। মুসলিমদের নিকট হতে এ ধরণের কর গ্রহণ করাও বৈধ নয়। এটা খারাজ হিসাবে গণ্য করার কোনো কারণ নেই। এই করকে খারাজ মনে করে উশর আদায় করা হতে বিরত থাকা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ পরিত্যাগ করা হিসাবে গণ্য হবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

**২ নং মাসয়ালাঃ** যে সব ফসলে সেচ বা অন্যান্য খরচ করা হয় না বরং বৃষ্টির পানিতে তা সিঞ্চিত হয় তাতে দশ ভাগের এক ভাগ ফরজ হয়। আর যেসব ফল ও ফসলে সেচ, সার ইত্যাদি খরচ করা হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ফরজ হয়। বর্তমানে প্রায় সকল ফল ও ফসলের ক্ষেত্রে সেচ ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতে হয় ফলে এসব ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করতে হবে। উশরের বিধান হলো, চাষাবাদের ব্যয়ভার কর্তন না করে সম্পূর্ণ ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা। যেহেতু ফসলের উপর যে ব্যয় করা হয় তার বিনিময়ে রসুলুল্লাহ (ﷺ) দশ ভাগের এক ভাগের স্থলে বিশ ভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এতে প্রমানিত হয় যে, অন্য কোনোভাবে ব্যয়ভার কর্তন করা যাবে না।

মালিকুল উলামা আবু বকর ইবনে মাসউদ আল-কাশানী উশর সম্পর্কিত আলোচনাতে বলেন,

وَلَا يُحْتَسَبُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْغَلَّةِ مِنْ سَقْيٍ ، أَوْ عِمَارَةٍ ، أَوْ أَجْرِ الْحَافِظِ ، أَوْ أَجْرِ الْعُمَّالِ ، أَوْ نَفَقَةِ الْبَقَرِ

“ জমির মালিক শস্যের উপর সেচ কাজ, জমি তৈরী, পাহারাদার ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, হালের গরু ইত্যাদির পিছনে যে ব্যায় করেন তা হিসাব করা হবে না। ” [বাদাইউস-সানায়ী]

**৩ নং মাসয়ালাঃ** কোন কোন্ ফসলের উপর উশর হবে সে বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (رحمه الله) এর মতে বাঁশ, কাঠ ও খড় জাতীয় অপ্রয়োজনীয় তৃণ ছাড়া জমিতে যা কিছু উৎপণ্য হয় তার উপর উশর ফরজ। এ হিসাবে শাক-সব্জি, পেয়াজ-রসুন, আম-কাঠাল, ধান-পাট, গম ইত্যাদি সকল শস্যের উপর উশর ফরজ হবে। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেন,

{أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧]

তোমরা বৈধ উপার্জন হতে এবং ভূমিতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা হতে ব্যায় করো। [বাকারা/২৬৭]

**৪ নং মাসয়ালাঃ** বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, কোনো শস্য পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরজ হবে না। পাঁচ ওয়াসাক মোটামুটি ১৭ মন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

কোনো শস্য বা খেজুর পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই। [সহীহ মুসলিম]

ইমাম আবু হানীফা (ﷺ) এর মতে জমিতে উৎপন্ন ফসলাদিতে উশর ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিসাব নেই অর্থাৎ কম বা বেশি যাই উৎপন্ন হক তাতে উশর ফরজ হবে। অবশ্য ইমাম আবু হানীফার দুই ছাত্র মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (ﷺ) তার এ মতের বিরোধিতা করেছেন এবং জমহুর ওলামায়ে কিরামের অনরুপ রায় দিয়েছেন। তবে হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে আবু হানীফা (ﷺ) এর মতটির উপরই ফতওয়া দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ কম বা বেশি যে কোনো পরিমাণের ফসলের উপর উশর ফরজ হওয়ার মতটিই হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের নিকট গৃহীত সিদ্ধান্ত।

**৫ নং মাসয়ালাঃ** যদি জমির মালিক হয় একজন আর সেটা চাষ করে অন্য জন তবে এটা যদি বর্গা হিসাবে হয় অর্থাৎ ফসলের উপর জমির মালিক ও চাষী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অংশিদার থাকে তবে প্রথমেই ফসলের উশর আদায় করে তারপর সেটা উভয়ের মাঝে বণ্টন করতে হবে। যদি জমির মালিকের নিকট হতে টাকার বিনিময়ে বা বিনিময় ছাড়াই জমি ভাড়া নিয়ে অন্য কেউ চাষ করে তবে ফসলের মালিক যিনি ফসলের উশরও তিনি আদায় করবেন, জমির মালিক নয়। অর্থাৎ ভাড়া গ্রহণকারী ওশর আদায় করবে, জমির ভাড়াও আদায় করবে। ইমাম আবু হানীফার দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত এটাই। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা ভিন্ন মত পোষন করেন । ইবনে আবেদীন আশ-শামী বলেন, ( فإن العشر على المستعير اتفاقا وعلى المستأجر على قولهما المأخوذ به) " যিনি বিনিময় ছাড়ায় অন্যের জমিতে চাষ করেন তার ব্যাপারে তিনি ইমাম একমত যে, উশর সেই আদায় করবে জমির মালিক নয় কিন্তু ভাড়া প্রদান করে যে ব্যক্তি জমি চাষ করে তার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা ভিন্ন মত পোষণ করলেও এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতটিই গ্রহণযোগ্য" [ফতওয়ায়ে শামী]। অর্থাৎ ভাড়া গ্রহণকারীর উপর উশর ফরজ হওয়াই হানাফী মাযহাবের মত। শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মতও একই।

## مصارف الزكاة

## যাকাত কাকে দেওয়া যায়।

সকল ওলামায়ে কিরাম এক মত যে যাকাত আট প্রকার লোককে দেওয়া যাবে যাদের নাম আল্লাহ (ﷻ) নিজে সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন। সেই আটটি প্রকার হলো,

[১] ফকীর বা গরীব [২] মিসকীন বা অভাবী [৩] যাকাতের কাজে নিয়োযিত ব্যক্তি [৪] কাউকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য [৫] দাস মুক্তিতে [৬] ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি [৭] ফা সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় [৮] পথিক।

**১ নং মাসয়ালাঃ** হানাফী মাযহাবের ওলমায়ে কিরামের নিকট গরীব বা অভাবী ব্যক্তি বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। হাম্বলী ও শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম এর নিকট অভাবী ব্যক্তি বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যার দৈনন্দিন প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার মতো সম্পদ নেই। আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট দুজন লোক যাকাত প্রার্থণা করলে তিনি লক্ষ করলেন তারা কর্মক্ষম ফলে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদের যাকাত দেবো কিন্তু আসলে ধনী ব্যক্তি ও কর্মক্ষম ব্যক্তির যাকাতে কোনো অংশ নেই।

এই হাদীস থেকে হাম্বলী ও শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম দলীল দিয়েছেন যে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার সামর্থ যার আছে তাদের যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (رحمه الله) এর দলীল হলো রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী, (تؤخذ من أغنيائهم وترد إلي فقرائهم) “ যাকাত নেওয়া হবে ধনী ব্যক্তিদের নিকট হতে এবং তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে দরীদ্রদের মাঝে” [বুখারী ও মুসলিম] এই হাদীস প্রমান করে যে যাদের নিকট হতে যাকাত গ্রহণ করা হচ্ছে অর্থাৎ যার নিসাব পরিমাণ মাল রয়েছে সে ধনী এবং যার নিকট এই পরিমান সম্পদ নেই সে ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্র। এই সকল দলীল প্রমানের সাথে সমন্বয় সাধন করে হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম (رحمه الله) মানুষকে তিনভাগে ভাগ করেছেন,

(ক) যার নিসাব পরিমান সম্পদ রয়েছে এবং তার উপর এক বছর কাল অতিবাহিত হয়েছে তাদের নিকট হতে যাকাত গ্রহণ করা হবে। যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে কিন্তু তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়নি তাদের নিকট ফিতরা গ্রহণ করা হবে যাকাত নয়। এই উভয় প্রকার লোকদের যাকাত প্রদান করা যাবে না।

(খ) যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই কিন্তু নিজের প্রয়োজন মেটানোর মতো সক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ তার আছে। এই প্রকার লোকদের নিকট হতে যাকাত গহণ করা হবে না। তারা যাকাতের মাল হতে কিছু প্রার্থনাও করতে পারবে না। তবে এদের যাকাতের অর্থ হতে প্রদান করা যাবে।

(গ) যার নিসাব পরিমান সম্পদ নেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর মতো আর্থিক ও শারীরিক শক্তিও নেই। এদের যাকাতের মাল হতে প্রদান করা যাবে। এরা মানুষের নিকট দান-খয়রাত প্রার্থণাও করতে পারবে। [আল মুহীত]

হানাফী মাযহাবের আলেমরা আবু দাউদ শরীফের হাদীসটিকে দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের উপর পযোজ্য বলে মনে করেন তাদের মতে উক্ত হাদীসের উল্লেখিত দুজন ব্যক্তি যাকাতের মাল হতে প্রার্থণা করার কারনে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের তিরষ্কার করেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন "তোমরা ইচ্ছা করলে আমি তোমাদের এ সম্পদ দেবো" এ থেকে বোঝা যায় তাদের যাকাত দেওয়া বৈধ। অর্থাৎ এ প্রকৃতির লোকদের উচিৎ মানুষের নিকট প্রার্থনা না করা যেহেতু তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো সক্ষমতা রয়েছে কিন্তু তারা প্রার্থণা না করলে যাকাতের মাল হতে তাদের সহযোগিতা করা যায়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের রায়ই সঠিক। কেননা যে ব্যক্তি কায়িক পরিশ্রম করে নিজের সংসার চালিয়ে নিচ্ছে যদিও তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটে যাচ্ছে কিন্তু তাকে ধনী বলা যায় না। এমন ব্যক্তিকে যাকাতের মাল হতে সহযোগিতা করা হলে আশা করা যায় যে, তার জীবিকার স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা হবে এবং তার অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হবে।

**২ নং মাসয়ালাঃ** মানুষের নিকট হতে যাকাত তোলা ও তা একত্রিত করার কাজে যারা নিয়োযিত থাকবে তারা ধনী হলেও তাদের যাকাতের মাল হতে প্রদান করা যাবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

**৩ নং মাসয়ালাঃ** মুয়াল্লাফাতে কুলুব (مؤلفة القلوب) বা অন্তর আকৃষ্ট করার জন্য যাকাতের মাল হতে কাউকে দেওয়া বলতে সাধারণত তিনটি শ্রেণীকে বোঝায় (ক) কোনো কাফিরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য (খ) কোনো কাফিরকে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করা হতে বিরত রাখার জন্য (গ) নও মুসলিমদের অন্তরে ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য। জমহুর ওলমায়ে কিরামের মতে তিনটি উদ্দেশ্যেই ব্যায় করা যায়। হানাফী মাযাহাব মতে এই খাতটি বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে। কাফিরদের যাকাতের মাল হতে কিছুই প্রদান করা যাবে না আর নও মুসলিম দরিদ্র না হলে বা অন্য কোনো কারণে যাকাত পাওয়ার যোগ্য না হলে তাদের কিছুই দেওয়া যাবে না।

**৪ নং মাসয়ালাঃ** হানাফী মাযহাব মতে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যার ঋণ বাদ দিলে তার নিকট নিসাব পরিমান টাকা অবশিষ্ট থাকে না। এই ব্যক্তিকে যাকাতের মাল হতে সহযোগিতা করা বৈধ। যাদের উপর হঠাৎ বিপদ আপদ আপতিত হয় বা অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি কারণে বিপুল পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয় তারাও এই

খাতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

**৫ নং মাসয়ালাঃ** ফী সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় বলতে সকল ওলামায়ে কিরামের মতে কাফিরদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করা বোঝায়। অর্থাৎ কাফিরদের মুকাবিলায় যুদ্ধরত মুজাহিদ যদি ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম হয় এবং রাষ্টীয় খাত হতে তার ব্যায়ভার বহন না করা হয় তবে তাকে যাকাতের মাল হতে প্রদান করা যাবে। মালেকী মাযহাবের মতে যুদ্ধে যেসব সরঞ্জাম ও সামগ্রীর প্রয়োজন হয় সেগুলো ক্রয় করার খাতে যাকাতের অর্থ ব্যায় করা যাবে। হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের ফিকহী কিতাবসমূহতে [যেমন হেদায়া আল-মুগনী ইত্যাদি] স্পষ্ট বলা হয়েছে রাস্তাঘাট সংস্কার, মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে যাকাতের অর্থ ব্যায় করা বৈধ নয়। বর্তমানে যারা ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে রাস্তাঘাট সংস্কার, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের বিভিন্ন উপায় ও উপকরণে যাকাতের মাল ব্যয় করার পক্ষে ফতওয়া দিচ্ছেন তাদের কথা সঠিক নয়। যুক্তির দাবীতেও তাদের এই ব্যাখ্যা সঠিক প্রমাণিত হয় না। যদি ফী সাবিলিল্লাহ অর্থ যে কোনো ধরণের কল্যাণময় কাজ বা যে কোনো প্রকার দ্বীনী কাজ হবে তবে যাকাতের জন্য পৃথকভাবে ৮ টি খাত নির্ধারণ করার প্রয়োজন কী?

**৬ নং মাসয়ালাঃ** আয়াতে পথিক বলতে এমন মুসাফিরকে বোঝানো হয়েছে যার নিজ এলাকাতে যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে কিন্তু কোনো দেশে সফরকালীন অবস্থায় নিঃস হয়ে গেছে। এই ব্যক্তিকে যাকাতের মাল হতে প্রদান করা বৈধ। তবে এমন ব্যক্তির জন্য উত্তম হলো সম্ভব হলে কারো নিকট ঋণ হিসাবে কিছু টাকা গ্রহণ করা এবং স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর তা পরিশোধ করা কিন্তু এমন অববস্থায় যাকাতের মাল হতে সম্পদ গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে এবং স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর এই টাকা ফেরত দেওয়া লাগবে না।

**৭ নং মাসয়ালাঃ** নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, দাদা-দাদী ও নান-নানীর পিতা মাতা এভাবে উপরের সকল জনক-জননী এবং নিজের পুত্র-কণ্যা, নাতি-নাতনী ও তাদের সন্তানরা এভাবে নিচের সকল বংশধরদের যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। স্বামীর জন্য স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। এসকল বিষয়ে আলেমরা ইজমা করেছেন। হানাফী মাযহাব মতে স্ত্রীর জন্যও স্বামীকে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। হাম্বালী মাযহাবে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। শাফেঈ মাযহাব মতে স্ত্রা স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে স্বামী স্ত্রাকে দিতে পারবে না। এ বিষয়ে তাদের দলীল হলো, সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীস যেখানে এসেছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর স্ত্রীকে বললেন, (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) “ তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তান যাকাত

পাওয়ার বেশি যোগ্য ” হানাফী মাযহাবের আলেমরা বলেছেন হাদীসটিতে নফল সাদাকার কথা বলা হচ্ছে ফরজ যাকাতের কথা নয়। তাদের যুক্তি হলো হাদীসে স্বামীর সাথে সন্তানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে আর সন্তানের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। এর উত্তরে অন্যান্য আলেমরা বলেছেন এখানে সন্তান বলা হয়েছে রুপক অর্থে অর্থাৎ উক্ত মহিলার সন্তান নয় বরং ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর অন্য পক্ষের সন্তান। তারা আরো বলেন স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না এ বিষয়ে কোনো দলীল নেই অতএব এই শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফী মাযহাবের আলেমরা বলেন যেহেতু স্বামীকে যাকাত দিলে সে তা স্ত্রীর উপর ব্যয় করে ফলে উক্ত স্ত্রী নিজের যাকাতে নিজেই উপকৃত হয় যা অনুচিত। মোট কথা এই মাসয়ালাতে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে সুতরাং স্ত্রীর উচিত বিতর্ক থেকে দূরে অবস্থান করা এবং স্বামীকে যাকাত দেওয়া হতে বিরত থাকা। উপরে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া ভাই-ভাইপো, চাচা-মামা, খালা-ফুফু ইত্যাদি নিকটাত্মীয়কে যাকাত প্রদান করা বৈধ। আর আল্লাহই ভাল জানেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।